3.3-Research Publication

3.3.1 Number Of Research Papers Published Per Teacher In The Journals Notified On UGC Care List During The Last Five Year(2018-2023)

Sl No	Name Of Teacher	Department Of the Teacher	Name Of Journal	Title Of Paper	Title Of Book	Name Of The Publisher	Year Of Publication	Link To Website Of The Journal	ISSN Number	ISBN Number	Peer\ Care List Journal (Yes/No	Individual Or Jointly	URL
1	Ajmira Khatun	Bengali	Sukhopath Online Magazine (puja number , October , 2022)	Special f eature article on writings of Trailokyanath Mukhopadhya		THE WALL	October , 2022	www.sukhopath.in				Individual	https://sukhopath.in/sarad-sankha-2022/
1	Ajmira Khatun	Bengali	Sukhopath Online Magazine	Interview of writer Abul basher		THE WALL	October , 2022	www.sukhopath.in				Individual	

Principal
Al-Ameen Memorial Minority College
Jogibattala, Baruipur, Kol.-145

23 Sep 2022

আসছে
সুখপাঠ শারদ সংখ্যা
প্রকাশিত হবে মহালয়ায়
শারদ সংখ্যা পড়া যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
পড়ার জন্য দেখুন www.sukhopath.in

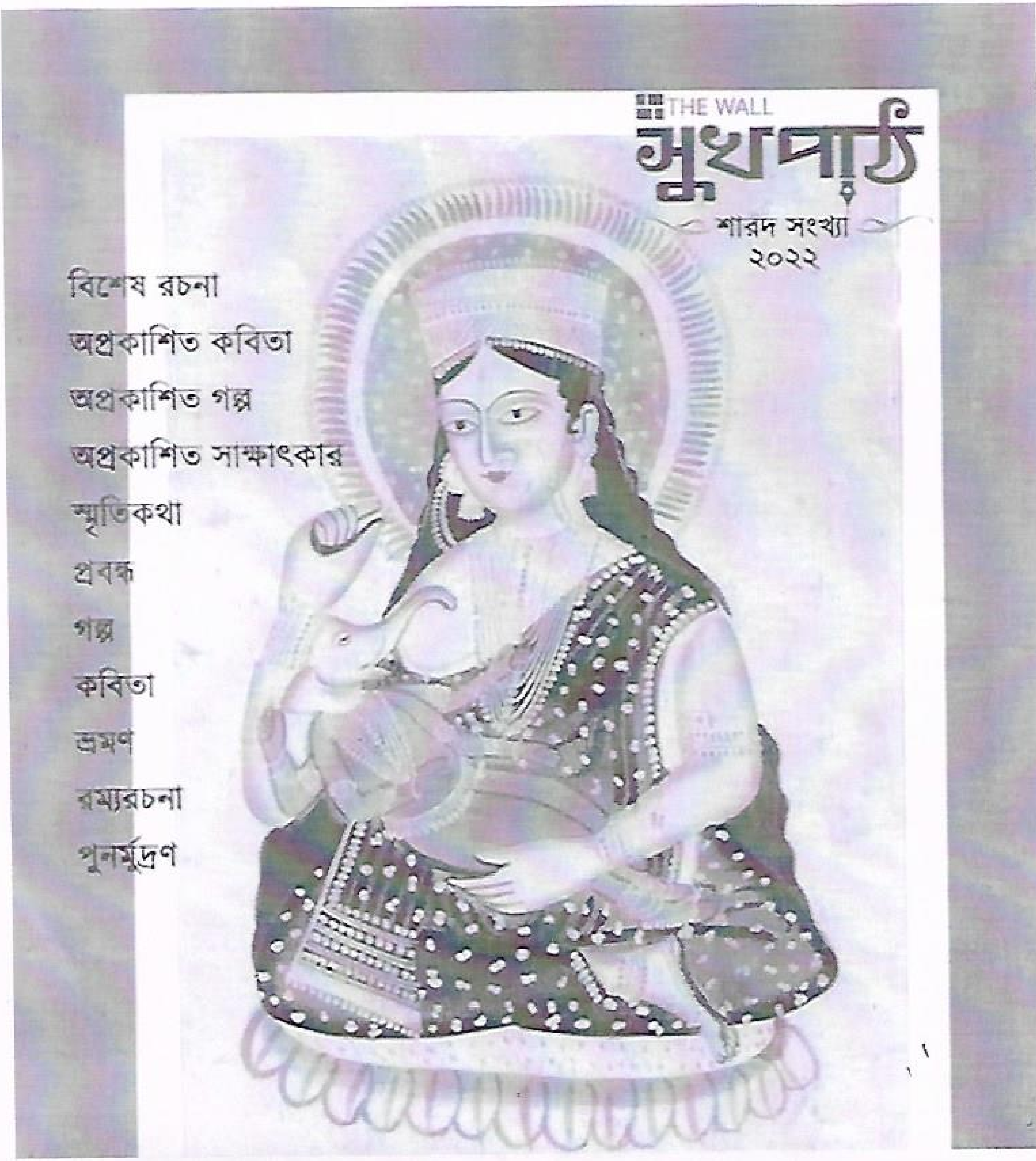

সুখপাঠ **Sukhopath**

25 Sep 2022 ·

প্রকাশিত হল
'সুখপাঠ' শারদ সংখ্যা ২০২২
রইল সম্পূর্ণ সূচিপত্র
'সুখপাঠ' শারদ সংখ্যা পড়া যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
পড়ার জন্য দেখুন
https://sukhopath.in/sarad-sankha-2022/

দ্য ওয়াল সাহিত্য পত্রিকা

THE WALL

সুখপাঠ

বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সাহিত্য পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ, শারদ সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯, অক্টোবর ২০২২

বিশেষ রচনা
কে এস রাধাকৃষ্ণান
রূপশ্রী সেন
দেবর্ষি সারগী
শুভ্রসত্ত্ব ঘোষ
শান্তনু চক্রবর্তী
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
দময়ন্তী দাশগুপ্ত
সুমনা দাস সুর
দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
আজমিরা খাতুন

অপ্রকাশিত কবিতা
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অপ্রকাশিত গল্প
অনিল ঘড়াই

অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার
নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতিকথা
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

প্রবন্ধ
রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সুপ্রতিম কর্মকার

ভ্রমণ
জগন্নাথ ঘোষ
শক্তিপদ ভট্টাচার্য

গল্প
অভিজিৎ সেন
অমর মিত্র
সৌম্য বৈরাগী
অনিতা অগ্নিহোত্রী
প্রচেত গুপ্ত
জয়ন্ত দে
তিলোত্তমা মজুমদার
অরিন্দম বসু
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়
সায়ন্তনী ভট্টাচার্য
শমীক ঘোষ
মৃত্তিকা মাইতি
হামিরউদ্দিন মিদ্যা

কবিতা
শ্যামলকান্তি দাশ
বিজয় সিংহ
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়
যশোধরা রায়চৌধুরী
বিভাস রায়চৌধুরী
দেবাশিস চন্দ
শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিমন্যু মাহাত
সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়

Sukhopath

19 Sep 2022 ·

আসছে
সুখপাঠ শারদ সংখ্যা
প্রকাশিত হবে মহালয়ায়
www.sukhopath.in -এ গিয়ে পত্রিকা সংগ্রহ করা যাবে।

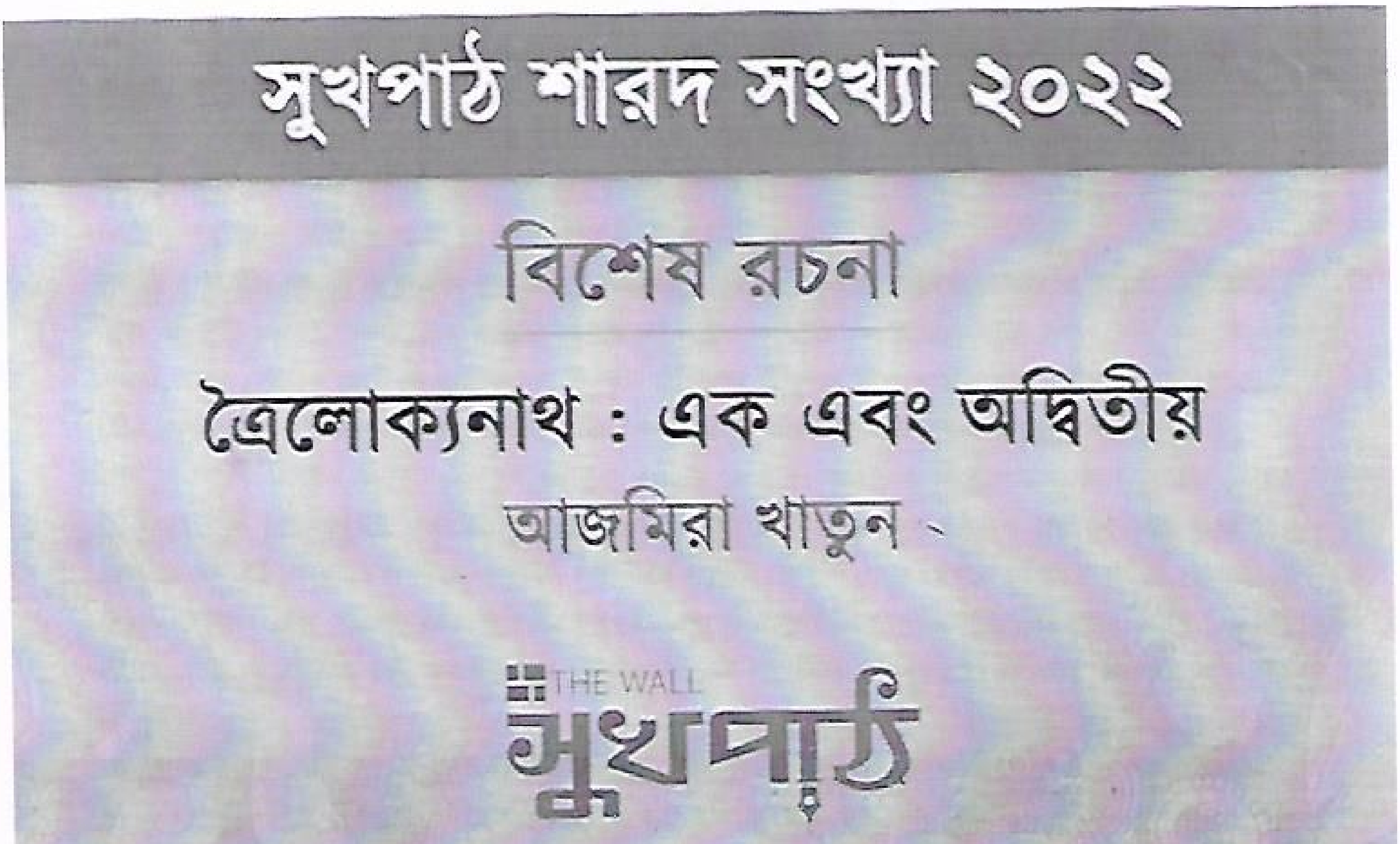

ত্রৈলোক্যনাথ : এক এবং অদ্বিতীয়

আজমিরা খাতুন

ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গ রচনার ধারা শুরু হয়।কবিতা,নাটক,কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গের কিছু না কিছু নিদর্শন থেকে যায়। বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভটরস ও হাস্যরসের ইতিহাসও লেখা হয়েছে। কেননা ব্যঙ্গের সঙ্গে হাস্যের যোগ আছে। তবে দুটো কখনই এক নয়। হাস্য এবং ব্যঙ্গের সম্পর্ক পারস্পরিক। ব্যঙ্গের কিছু রূপভেদ আছে। কোথাও এর প্রকাশ সরাসরি, কোথাও ছদ্ম আবরণে ঢাকা।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে আট রকম রসের কথা আছে। তার মধ্যে হাস্যরস অন্যতম। আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত— এই আট প্রকার রসের কথা বলেছেন।অভিনব গুপ্তের মতে রস নয় প্রকার এবং এই রসের আভাস শেষ পর্যন্ত হাস্যে পরিণতি লাভ করে। রূপ গোস্বামীর মতে হাস্যরস গৌণরস। আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে যে অদ্ভুত রসের কথা বলেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ সেই পথেই যাত্রা করেন।

পাশ্চাত্য মতে হাস্যরস চার প্রকার। উইট বা বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা, হিউমার বা কৌতুক, স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং ফান বা মজা।হিউমারের আবেদন হৃদয়ের কাছে, উইটের আবেদন মস্তিষ্কের কাছে। উইটের মর্ম উপলব্ধি করা সহজ নয়। কোনও কোনও লেখক উইট বা বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার মাধ্যমে পাঠকের বুদ্ধিকে নাড়া দিয়ে যান।কথার মারপ্যাঁচই উইটের হাস্যরস সৃষ্টি করে।

হিউমারকে কেউ বলেন কৌতুক, কেউ বলেন করুণ হাস্যরস। এই হাসিতে কোনওরকম আক্রমণ থাকে না।বরং যাকে নিয়ে হাসির পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেও হেসে ওঠে, মজা করে।কিন্তু এই হাসি প্রবল ও উচ্চকিত নাহয়ে মৃদু ও অনুচ্চ হয়। এর গভীরে থাকে বেদনা। কারণ লেখক যে গভীর ও ব্যাপক মানব সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে আসেন তার মধ্যে জীবনের আনন্দের সঙ্গে বিষাদও মিশে থাকে।

স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক।এক্ষেত্রে লেখকের উদ্দেশ্য সমাজ ও ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অসঙ্গতি ধরিয়ে দেওয়া।তার কঠোর সমালোচনা করা। তবে খেয়াল রাখতে হবে লেখক যেন তার উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রাখেন। কারণ প্রকট ও প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উপাদান হতে পারেনা।ত্রৈলোক্যনাথের লেখায় ভূত-প্রেত, পশু-পাখি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।এদের মাধ্যমে তিনি তাঁর ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রাখতে পেরেছেন।

ফান বা বিশুদ্ধ মজাকে অনেক লেখকই কৌতুক রস বলতে চান। আমাদের বিবেচনায় কৌতুক বলতে বোঝায় হিউমার। ফান হল সাধারণ মজা বা ঠাট্টা-ইয়ার্কি, যার মধ্যে মাঝে মাঝে স্থূল রুচিরও প্রকাশ ঘটতে পারে।কিছু কিছু লেখক এই ফানের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করে থাকেন।সেদিক থেকে দেখলে ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের লেখায় হিউমার এবং স্যাটায়ারের উপস্থিতি যথেষ্ট। এঁরা ফান জাতীয় হাস্যরস সৃষ্টিতে যত্নবান হননি। এমনকি এঁদের লেখায় উইট প্রায় নেই বললেই চলে। হাস্যরসের এই ধারাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে আর কেউ এগিয়ে আসেননি।

আসলে হাস্যরস একপ্রকার ভাবদৃষ্টি।যার মূলে থাকে অ্যাবসার্ডিটি। লেখক মানব জীবনের অসংগতি ও বৈষম্যকে উদার অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করেন এবং সাহিত্যে তার ছবি আঁকেন।সৃজনশীল রসসাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য

মূলত হিউমার এবং স্যাটায়ার ব্যবহৃত হয়। রম্যরচনায় উইট, নাটকে, নকশা জাতীয় রচনায় কখনও কখনও ফান ব্যবহৃত হয়।ত্রৈলোক্যনাথ মূলত ব্যঙ্গ শিল্পী, তাঁর হাস্যরসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শিশিরকুমার দাশ বলেছিলেন,"যাঁরা সাহিত্যে সংস্কারক, তাঁদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ব্যঙ্গ। ত্রৈলোক্যনাথের তূণে শ্রেষ্ঠ বাণগুলি হাসির। মৃদু হাসি অধরের কোণে ফুটতে না ফুটতে হঠাৎ দমকা হাসিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।পরক্ষণেই সেই হাসিই আবার মিলিয়ে যায় এবং বজ্রের আগে বিদ্যুতের মত প্রবল ব্যঙ্গের আগে হাসির স্পর্শ লাগে। ...এই বাংলা ব্যঙ্গ রচনার ধারায় ত্রৈলোক্যনাথ অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক।"

ত্রৈলোক্যনাথ নির্দিষ্ট কোনও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যঙ্গ করেননি। সমাজের বহু প্রথাকে তিনি আক্রমণ করেছেন। মূলত হৃদয়হীন সমাজ ও মানুষের নির্দয়তার বিরুদ্ধেই তাঁর ব্যঙ্গ, মনুষ্যত্বের অপমানের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদের মাধ্যম হল ব্যঙ্গ। হিন্দু সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে তিনি কঠোরভাবে আক্রমণ করেছেন। সেখানেই তাঁর ব্যঙ্গ আক্রমণাত্মকএবং উদ্দেশ্যমূলক। তবে এই উদ্দেশ্যমূলকতা তাঁর লেখার কোনও ক্ষতি করেনি বরং তা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

ত্রৈলোক্যনাথের লেখার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল অ্যাবসার্ডিটি।পাশ্চাত্যে যা অ্যাবসার্ড, বাংলায় তাকে বলতে পারি অদ্ভুত, উদ্ভট, আজগুবি, অবাস্তব, হাস্যকর, অযৌক্তিক, অসম্ভব, অসংলগ্ন, অসংগতি ও শূন্যতা। অর্থাৎ যা কিছু উদ্দেশ্যহীন, অসামঞ্জস্য তাই অ্যাবসার্ড। যদিও অ্যাবসার্ড কথাটি উপন্যাসের থেকে নাটকের প্রাসঙ্গিকতায় বেশি ব্যবহৃত। অ্যাবসার্ড সম্পর্কে পাশ্চাত্য নাট্যকার ইউজিন ইয়নেস্কো বলেছেন— "Absurd is that which is devoid of of purpose cut off from his religion metaphysical and transcendental roots, man is lost; all his action become senseless, absurd, useless."।পাশ্চাত্যে অ্যাবসার্ড ভাবনার প্রকাশ ঘটেছিল Albert camus, saul Bellow, Franz kafka, Jean paul sartre, Samuel beckett, Eugene lonesco, Donald Barthelme প্রমুখের লেখায়।তবে পাশ্চাত্যে অ্যাবসার্ডিটির সঙ্গে প্রাচ্যের অদ্ভুত রস বা ত্রৈলোক্যনাথের যে অদ্ভুত রস তার কোনও মিল নেই।

চর্যাপদ থেকে শুরু করে চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গলে কৌতুক রসের পরিচয় ছিল। তবে প্রাক-বঙ্কিম পর্বের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের যে ধারা আমরা লক্ষ করি তার মধ্যে উইট জাতীয় হাস্যরস তো ছিলই না এমনকি নির্মল ও বিশুদ্ধ হিউমারেরও অভাব ছিল। সুরুচিপূর্ণ বিশুদ্ধ হিউমার এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত উইটের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের প্রথম পরিচয় ঘটে বঙ্কিম সাহিত্যে। বঙ্কিম পরবর্তীযুগে এবং প্রাক-রবীন্দ্র পর্বে বাংলা কথাসাহিত্যে বিভিন্ন শাখার সমৃদ্ধি ঘটলেও হাস্যরস সৃষ্টিতে বাঙালি লেখকদের তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। এই সময় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশকিছু রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা ত্রুটি যুক্ত। কেননা হাস্যরসের মধ্যে কৌতুক স্নিগ্ধতা ও ব্যঙ্গঝাঁঝের ভারসাম্য এঁরা বজায় রাখতে পারেনি। তাছাড়া এঁদের লেখা ছিল তীব্র ব্রাহ্ম বিদ্বেষপূর্ণ। ঠিক এই আংশিকতা ও বিদ্বেষপূর্ণ হাস্যরসের পটভূমিতেই হাস্যরসের স্রষ্টা হিসাবে ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাব ঘটে।

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যে আজগুবি রসের একমাত্র উচ্চাঙ্গের শিল্পী। বাংলা গল্প কথনের মৌখিক পুরনো রীতিটি পরিপূর্ণ আত্মস্থ করে তিনি নতুন ভাব-ভাবনার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তাই সাহিত্য ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাবকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রকে আমরা যে অর্থে ঔপন্যাসিক বলি, ত্রৈলোক্যনাথকে ঠিক সেই অর্থে ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি বাংলা সাহিত্য যে রস পরিবেশ করেছিলেন তা বাঙালি পাঠক তার আগে কখনও আস্বাদন-করেনি। হাস্যরসকে আশ্রয় করে ইতিপূর্বে আর কেউ উপন্যাস রচনা করেনি এমন নয়, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। যার জন্য তিনি অন্য লেখকদের থেকে

আলাদা।বস্তুত তাঁর সাহিত্য একটা স্বতন্ত্র শ্রেণি রূপে গণ্য হতে পারে। এর আগে বাংলা সাহিত্য অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হলেও ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্ট উদ্ভটরস বাংলা সাহিত্যে একেবারে অজ্ঞাত ও অভিনব।

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর বৈচিত্রময় জীবন সংগ্রামে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা এবং মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা হয়ে কাজ করে। এর অন্যতম সার্থক প্রয়োগ 'কঙ্কাবতী' উপন্যাস। পরে তিনি 'ফোকলা দিগম্বর','পাপের পরিণাম','ময়না কোথায়',মুক্তামালা' প্রভৃতি উপন্যাস ও 'ভূত ও মানুষ' ('লুল্লু','নয়নচাঁদের ব্যবসা), 'ডমরু চরিত', 'মজার গল্প', 'জন্মভূমি', 'বাঙ্গাল নিধিরাম' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ লেখেন। তবে 'কঙ্কাবতী' তাঁর প্রথম এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। অদ্ভুত ও উদ্ভট রসের এই উপন্যাসের দুটি ভাগ। প্রথমভাগে বাংলার গ্রামীণ সমাজ বাস্তবতার ছবি। দ্বিতীয়ভাগে আছে রূপকথার জগৎ।

ত্রৈলোক্যনাথের লেখার আজগুবি ভাবকে বোঝার জন্য আমরা প্রথমে আলোচনার জন্য রাখলাম 'কঙ্কাবতী' উপন্যাস। উপন্যাসটি শুরুটাই আমাদের একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যেমন, এই ছবিটি কোন রাজ্যের? বাস্তবের নাকি কল্পলোকের? অসম্ভবের এই ছন্দ— একি সত্য, নাকি নিতান্তই আজগুবি? উপন্যাসের নায়িকা কঙ্কাবতী বংশজ ব্রাহ্মণ তনু রায়ের কন্যা। তার মা তার বাল্যসাথী খেতুর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে। কিন্তু তনু রায় টাকাপয়সা, গয়নাগাঁটির লোভে খেতুর পরিবর্তে বৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরীকে পাত্র হিসেবে ঠিক করে। জনার্দন চৌধুরীও বিয়ের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। খেতু প্রতিবাদ জানাতে গেলে বরফ খাওয়ার অভিযোগে তাকে একঘরে করে দেওয়া হয়। খেতুর সঙ্গে বিয়ে না হওয়ার দুঃখে এবং জনার্দন চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আশঙ্কায়কঙ্কাবতীর প্রচণ্ড জ্বরবিকার হয়। এই বিকার অবস্থায় সে মনে মনে চলে যায় রূপকথার রাজ্যে। সেখানে বিচিত্র সব জীবের সঙ্গে তার দেখা হয়।তারপর ঘটতে থাকে আজব সব ঘটনা। এই উপন্যাসে বাস্তব-অবাস্তব ওসম্ভব-অসম্ভব—এই দুইয়ের সংযোগস্থল অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন। তাই রূপকথা থেকে বাস্তবে বিচরণ করতে আমাদের কোনও অসুবিধা হয় না। রূপকথার মেজাজের জন্য কঙ্কাবতী ছোট-বড় সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরমধ্যে আছে গভীরতর ব্যঞ্জনা ও লেখকের সমাজচেতনার পরিচয়।

খেতুর জীবন অভিজ্ঞতাকে কঠিন বাস্তবের কাহিনি বলে ধরে নেওয়া যায়,কিন্তু নাকেশ্বরীর প্রসঙ্গ এই বাস্তব সমাজজীবন থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তবে নাকেশ্বরীকে প্রতীকী চরিত্র হিসেবে দেখলে মনে হয় সে যেন মানুষের ইচ্ছাপূরণের পথে মূর্তিমান বিঘ্নের ভয়ংকর রূপ। খেতু ও কঙ্কাবতীর প্রতি তার নির্দয় আচরণ,অসহায়তা পাঠকের গভীর সহানুভূতি আকর্ষণ করে।এদের মাঝখানে স্কল-স্কেলিটনের অদ্ভুত উপস্থিতি যেন কমিক রিলিফ।উপন্যাসে এদের আমরা খেতুর হিতাকাঙ্ক্ষী ও পরোপকারী চরিত্র রূপে দেখি। কিন্তু একটু ভাবলে বোঝা যায়, এরাই লেখকের সামাজিক ব্যঙ্গের হাতিয়ার। শুধু স্কল-স্কেলিটন নয়, রূপকথা অংশে তিনি যেসব চরিত্র ব্যবহার করেছেন তার প্রায় সব চরিত্রই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য সাধন করছে। এদের দিয়ে সরস ও মৃদু ব্যঙ্গের খোঁচায় লেখক উনিশ শতকের সমাজ প্রেক্ষিতটি দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। মড়ার মাথা অর্থাৎ স্কল প্রশ্ন করেছে খেতুকে—"ইংরেজি পড়িয়া তুমি নাকি ভূত মান না?" এখানে ভূতের ছদ্মবেশে স্কল-স্কেলিটন কাদের প্রতিনিধিত্ব করছে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উদ্ভূত সংস্কারমুক্ত আন্দোলনের যারা বিরোধিতা করেছিল, যারা অন্ধবিশ্বাস দিয়ে রক্ষণশীল মনোভাবকে আঁকড়ে ধরে জোর করে সংস্কারকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল,যারা ইংরেজি ভাষার প্রতি অন্ধ, মোহগ্রস্ত হয়েমাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে, তাদেরও ব্যঙ্গ করেছেন লেখক। স্কলের কথায়—"আমরা কোম্পানী খুলিয়াছি। কোম্পানীর নাম রাখিয়াছি 'স্কল-স্কেলিটন এন্ড কোং'।ইংরেজি নাম রেখেছি কেন তা জান? তাহা হইলে প্রসার বাড়িবে, মান হইবে। ...যদি নাম রাখি'খুলি কঙ্কাল এবং

কোম্পানী' তাহা হইলে কেউই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না।" স্কল আরও বলে—"বেদের কথা বল আর শাস্ত্রের কথা বল,বিলাতি সাহেবরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদপুরাণ ভাল হয়। দেশী পণ্ডিতদের কথা কেউ গ্রাহ্য করেনা। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের কোম্পানীর নাম স্কল-স্কেলিটন এন্ড কোং।" এই যে শ্লেষ, তা কি নিছকই সে যুগের?

ঊনবিংশ শতকের সমাজ ইতিহাসের আরও একটি দিককে তুলে ধরার জন্য তিনি এনেছেন'ব্যাঙ সাহেব' মিস্টার গামিশ চরিত্রটি। ইংরেজি সভ্যতার অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণকারীদের একজন 'ব্যাঙ সাহেব'। সে কোট-প্যান্ট পরেঅবিরাম, অর্থহীনভাবে ইংরেজি বলার চেষ্টা করেছে। কেবলমাত্র লোকচক্ষুর আড়ালে সে মাতৃভাষায় কথা বলে কারণ, "লোকে যদি শোনে যে তিনি বাঙ্গালা কথা কহিয়াছেন,তাহা হইলে তাঁহার জাত যাইবে।" এই 'ব্যাঙ সাহেব'-দের কি এখনও, ইংরেজ রাজত্বের দিবস গত হওয়ার বহু পরেও, আমাদের এই সমাজেই আমরা দেখতে পাই না? ঔপনিবেশিক বাস্তবতার অন্তঃসারশূন্যতা, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সারসত্যতা, ইংরেজ শাসনব্যবস্থার নগ্নতা, মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ভারতীয়দের আকৃষ্ট হওয়া, এমনকি ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণকে ব্যঙ্গ করতে গিয়েই লেখক মশা, হাতি, ভূত কোম্পানী,স্কল-স্কেলিটন, কাঁকড়া, নাকেশ্বরী ও তার মাসিকে রূপক চরিত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন।এছাড়া চাঁদ ও তার পরিবার,নক্ষত্রের বউ এবং আকাশের সিপাহিদের তো অদ্ভুত চরিত্রের কথা আছে। আসলে এসব বিচিত্র জগতের বিচিত্র চরিত্র নিয়ে অসম্ভব কল্পনায় রূপকথার জাল বোনার ফাঁকে ফাঁকে লেখক সমাজ সচেতনতারই পরিচয় দিয়েছেন। যেমন মশা ও তার পরিবারের মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুর দিকটি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। রক্তবতীর পিতা দীর্ঘশুণ্ড কঙ্কাবতীকে প্রশ্ন করে—"তুমি কার সম্পত্তি?"কঙ্কাবতী উত্তর দেয়, "পূর্বে আমি পিতার সম্পত্তি ছিলাম, পিতা আমাকে তিনসহস্র মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করিয়াছে। এখন আমি আমার পতির সম্পত্তি।"

শেষপর্যন্ত অনেক বাদানুবাদ, অনেক দর কষাকষির পর তিন ছটাক মানুষের রক্ত দিয়ে কঙ্কাবতীকে কিনে নেয় দীর্ঘশুণ্ড মশা। এখানেও নারীকেই নিছকই কেনাবেচার জিনিস হিসেবে বা পণ্য হিসেবে ভাবারজায়গাটিতে ব্যঙ্গের খোঁচা দিয়েছেন তিনি।শুধু সমাজ সচেতনতাই নয়, মশাদের প্রসঙ্গে লেখকের স্বদেশিকতারও প্রকাশ ঘটেছে মাঝে মাঝে। দীর্ঘশুণ্ড মশার চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরেজের আভাস পাওয়া যায়। তা স্পষ্ট হয় তার কথায়—"তুমি বলতো মা, রক্তবতী, ভারতের মানুষ কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে?" রক্তবতী বলে, "কেন বাবা!আমরা খাব বলিয়া তাই হইয়াছে।"

যেসব লোভী ইংরেজ বণিক ভারতীয়দের অবদমিত করে রাখার পক্ষপাতী ছিল,দীর্ঘশুণ্ড তাদের মতোই কথা বলেছে। জ্ঞানের আলো থেকে ভারতবাসীদের বঞ্চিত করলে, দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে শাসক শক্তির শোষণ করার সুবিধে হবে। ঊনবিংশ শতকে ভারতীয়রা যখন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে লাগল তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মনে আশঙ্কা তৈরি হয়। দীর্ঘশুণ্ড মশার কথায় তা স্পষ্ট—"আমি দেখিতেছি আমাদের ঘোর বিপদ। ভারতবাসীগণের রক্তপান করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় মশা এতদিন সুখে স্বাচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে ছিলেন। ...এক্ষণে কেউ কেউ মহাসাগর ও মহাপর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ...যেমন করিয়া হউক ভারতবাসীগণকে সে দুষ্ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে।"

অসৎ সেপাইদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে সেযুগের পুলিশ কর্মচারীদের কর্তব্যকর্মে গাফিলতি, অসৎ বা অন্যায়কারীর কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ, এ যুগেও যা সমান প্রযোজ্য।নিজের লাভ

না হওয়ার শর্তেও অন্যের ক্ষতি করা অসৎ বাঙালির স্বভাব নাকেশ্বরীর বিয়ে ভাঙার প্রসঙ্গ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন লেখক। সে বাঙালি আজও বর্তমান।

রূপকথা অংশের সমগ্র কাহিনিটুকুই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় ও স্নিগ্ধ কৌতুক রসে জারিত হয়ে উঠেছে। সমাজে নিগৃহীতা কঙ্কাবতী মাছেদের রাজ্যে গিয়ে যে ভালবাসা ও সহানুভূতি পেয়েছে, মানুষের সমাজে সেই ভালবাসার অভাব দেখিয়ে তিনি মনুষ্য হৃদয়হীনতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। মাছেরা শুধু তাকে তাদের রানি রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়নি,তার প্রাণপুরুষ খেতুর প্রসঙ্গ তুলে তার বিরহ বেদনার অবসান করতে চেয়েছে। রূপকথার জগতে দীর্ঘ পরিক্রমা কালে একমাত্র নাকেশ্বরী ভূতনি ছাড়া কঙ্কাবতী সকলের ভালবাসা ও সহানুভূতি পেয়েছে। 'ব্যাঙ সাহেব' মিস্টার গামিশ, যে একটা আধুলির শোকে বুদ্ধিহারা ও শোকগ্রস্ত, সেও কঙ্কাবতীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে শেষপর্যন্ত তাকে গ্রামের পথ বলে দিয়েছে। কিংবা মশা কন্যা রক্তবতীর কথা বলা যায়। সেও অসহায় কঙ্কাবতীর রক্ত পান করার সুযোগ পেলেও সখীত্বের মূল্য দিতে তার লোভ ত্যাগ করেছে। শুধু তাই নয়, কঙ্কাবতীর পতির জীবন উদ্ধারের জন্য তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। স্বার্থমগ্ন মানুষের সমাজে এইধরনের সহানুভূতি ও প্রচেষ্টা একেবারে অসম্ভব। রূপকথার জগতে মানুষ যখন তার নিজস্ব রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তখনই সে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন তনু রায়, যার স্বার্থচিন্তার জন্য কঙ্কাবতীর বিপদ, রূপকথার জগতে আবির্ভূত হয়ে সে কঙ্কাবতীর গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে বলার, তা হল 'ব্যাঙ সাহেব' গামিশের কথা, 'ব্যাঙের আধুলি'-র কথা। গামিশ ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ, যে তার নিজের সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেলে ভাবনায় আকুল হয়ে পড়ে। যে কোনও মূল্যে তাকে রক্ষা করাই তার একমাত্র চিন্তা। অর্থনীতির চিরকালীন ছবিটি এরকমই। ধনীর সম্পদের বন্টন হয় না, তা ধনিক শ্রেণিরই কুক্ষিগত থাকে। আজকের বিশ্বের এবং বিশেষ করে ভারতের সম্পদ বন্টনের যে অসম ছবি আমাদের সামনে রয়েছে তা ওই 'ব্যাঙের আধুলি'-র সত্যতাকেই ব্যক্ত করে। ত্রৈলোক্যনাথ বহু আগেই যার কথা বলে গিয়েছেন।

সাহিত্যিক হাস্যরসের যে হাসি তা নির্মল, নিরঞ্জন আনন্দ থেকে সৃষ্টি হয় না। তার মূলে থাকে কৌতুক।যে হাসির মূলে কৌতুক নেই সে রস আর যাইহোক, হাস্যরসের উদ্রেক করতে পারেনা। কৌতুক থেকে যে সুখের উৎপত্তি তাকে আনন্দ না বলে আমোদ বলা সঙ্গত। কেননা আনন্দে আছে স্নিগ্ধতা আর আমোদে আছে উত্তেজনা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই উপন্যাসে কৌতুকের ছড়াছড়ি। 'ব্যাঙ সাহেব'-এর সঙ্গে দুষ্টু হাতির ঝগড়া, আধুলির হিসেব,খব্বুর ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ, নাকেশ্বরী ও তার মাসির খেতুর মাংস রান্নার পরিকল্পনা, খোক্কসের বাচ্চা ধরার জন্য মশা ও হাতির কৌশল, কাশির বদলে ঢাকের শব্দ, চুলের বদলে কাছি, উকুনের বদলে হাতি দেখিয়ে ভয় দেখানোর মজাটা মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে পরবর্তীকালে প্রকাশিত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র সঙ্গে।

সামাজিক বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে একইসঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক, কৌতুকবহ অথচ রূপকথার মতো অসম্ভব স্বপ্ন-কল্পনাশ্রিত আজগুবি ও উদ্ভটরসের উপন্যাস ত্রৈলোক্যনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। তবুও 'কঙ্কাবতী' দ্বিতীয়ভাগ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য—"একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতে ছিল, হঠাৎ অর্ধরাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত হইতে আর একটি গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল। এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমতো করুণা ও কৌতুহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য শিষ্টাচার বহির্ভূত।"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে জানিয়েছেন— "কঙ্কাবতী-তে প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ গার্হস্থ্য জীবনমুলক, দ্বিতীয় খণ্ড একেবারে অবাস্তব, কল্পনাশ্রিত। তবে শেষপর্যন্ত কঙ্কাবতীর জ্বর-বিকারের সঙ্গে তাহার অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতাগুলিকে সম্পৃক্ত করিয়া বাস্তব মনস্তত্ত্বের মর্যাদা কোন ভাবে রক্ষা করা হইয়াছে।"

'কঙ্কাবতী' প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক অধ্যাপক তপন ভট্টাচার্য বলেছেন, "kankabati unmistakably proves that its fantasy is produced within and determined by its social contexts.Assuming the role of narrator Trailokyanath seemed to have led his text to struggle againstnthe limits of these contexts.Nevertheless the subaltern voices could articulate themselves on the basis of that very struggle."।

এইসব মতামত মনে রেখে বলা যেতে পারে,'কঙ্কাবতী'-র দ্বিতীয় ভাগের কিছু কিছু অংশ ত্রুটিযুক্ত, অবাস্তব, বাড়াবাড়ি বলে মনে হলেও এর সারল্য, রূপকথার ঢং, ভৌতিক পরিমণ্ডলের অবিমিশ্রিত আনন্দ আমাদের মনকে প্রসন্ন করে দেয়। এখানে অদ্ভুত ও আজব ঘটনার সমাবেশে মানুষ,ভূত-প্রেত, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, জীব-জড়ের পারস্পরিক আদানপ্রদানে যে ব্যঙ্গরস ও কৌতুক রসের উৎসারণ ঘটেছে, জল-স্থল-আকাশ মিলে যে রসলোক তৈরি হয়েছে, লৌকিক-অলৌকিকের মিশ্রণে যে হিউমার সৃষ্টি হয়েছে তা সবই যেমন হৃদয়গ্রাহ্য, তেমনই সূক্ষ্ম এর ব্যঙ্গোক্তি ও শ্লেষ।এছাড়া উইটের প্রয়োগও বুদ্ধিগ্রাহ্য।

'কঙ্কাবতী'-র পরে ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ফোকলা দিগম্বর'। এটি রঙ্গ-ব্যঙ্গ, কৌতুকপূর্ণ সামাজিক উপন্যাস। চার ভাগে বিভক্ত উপন্যাসটিতে প্রণয়াশ্রয়ী কাহিনি মিলনান্তক পরিণতি লাভ করেছে। রূপকথা বা ফ্যান্টাসি বর্জিত উপন্যাসটিতে বাস্তব জীবনভিত্তিক প্রণয়যুক্ত কাহিনি ব্যঙ্গ-কৌতুক, রঙ্গ প্রধান উপকাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যদিও কাহিনিটির মধ্যে মাঝে মাঝে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং উপকাহিনিটি প্রাধান্য বিস্তার করেছে। উপন্যাসের কথক ডাক্তার যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। স্মৃতিচারণা এবং ডায়রি লেখার ভঙ্গিতে তিনি উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে তিনি সেকালের সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির কথা এবং সমাজে নারীদের অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। কাহিনি যত এগিয়েছে ততই চরিত্রগুলির বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া গেছে।উপন্যাসটির ঘটনাধারা কোনও একটিমাত্র স্থানে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কাহিনি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার স্থানও পরিবর্তিত হয়েছে। উত্তর পশ্চিম ভারত, কাশী, কলকাতা,পূর্ববঙ্গের গ্রাম, তৎকালীন ব্রহ্মদেশ বা লাহোর হয়ে উঠেছে ঘটনাস্থল। শুরুতেই আমাদের পরিচয় ঘটে নায়িকা কুসুম বা কুসীর সঙ্গে। অপূর্ব সৌন্দর্য ও চাঞ্চল্যের পাশাপাশি স্বামীর সঙ্গে তার জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে।

রসময়বাবুর প্রথম পক্ষের কন্যা কুসী। জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই তার মায়ের মৃত্যু হয়। তার সব দায়িত্ব তার অসহায় দরিদ্র মাসির ওপর চাপিয়ে দিয়ে রসময় রায় বর্মায় চলে যায়, সেখানে এক বর্মি মহিলাকে বিয়ে করে।বর্মানির মৃত্যুর পর সে আবার বিয়ে করে এবং বর্মা থেকে ষাট বছর বয়েসি পাত্রের সঙ্গে কুসীর বিয়ের আয়োজন করে। অন্যদিকে ঘটনাচক্রে হীরালালের সঙ্গে কুসীর পরিচয় হয়। সে তার বাবা-মাকে না জানিয়ে কুসুমকে বিয়ে করে। সেই কথা জানতে পেরে তার বাবা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেয়। আরও কিছুদিন পর নৌকাডুবিতে হীরালালের মৃত্যুর খবর আসে। এই আঘাতে কুসীর জ্বরবিকার হয়। এখানে কঙ্কাবতীর সঙ্গে কুসীর মিল পাওয়া যাচ্ছে।

ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাসে হাসি ও কান্নার সম্পর্ক অসঙ্গতিমূলক নয়। হাসি-কান্নাকে কাছাকাছি এনে বা মিশিয়ে দিয়ে দুয়েরই অর্থ বাড়িয়ে তোলেন তিনি। স্বামী বিয়োগের বেদনা এবং অসমবয়েসি বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ের ভাবনায়

পীড়াকাতর কুসীকে বিয়ের আসরে আনা হলে বৃদ্ধ দিগম্বরের ব্যগ্রতা ও অসংযত আচরণ নিয়ে শিল্পীসুলভ নৈপুণ্যে জীবনরসিক ত্রৈলোক্যনাথ বেদনার পাশাপাশি জাগিয়ে তোলেন কৌতুক। কঙ্কাবতী এবং কুসীর ভাগ্যের মিল আছে। দু'জনেরই পিতা অর্থলোলুপ, তাদের কাছে কন্যার ভাবনার চেয়ে নিজের ভাবনাই বড়। কঙ্কাবতী ও কুসী দু'জনেই লেখাপড়া জানে, দু'জনেই দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত। কঙ্কাবতীর মতো কুসীও বৃদ্ধ বরের হাতে পড়ার আশঙ্কায় মর্মবেদনায় পীড়িত, সেও জ্বরবিকারে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনকি বিয়ের আসরে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার দুঃখময় জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক অনাবিল হাসির সঙ্গে যুক্ত করেছেন সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ। আর করুণ রসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন কৌতুক রস। যার ফলে ফোকলা দিগম্বরের সম্পর্কে পাঠকের মনে কখনও ঘৃণা জন্মায়, কখনও হাসির বাষ্প উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসে তার উপস্থিতি আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

রসময়বাবু মনে করেন দিগম্বর "দেখিতে সুপুরুষ নহেন, বয়স হইয়াছে। তবে সঙ্গতিপন্ন লোক, কন্যা আমার সুখে থাকিবে।"দিগম্বর নিজেকে অল্পবয়েসি যুবকের মতো দেখানোর জন্য সবসময় হাস্য পরিহাস করে থাকে, ফলে তার দাঁতহীন মাড়ি মাঝে মাঝে বের হয়ে পড়ে, তাই সবাই তার নাম দিয়েছে ফোকলা দিগম্বর। অসুস্থ কুসুমের শরীরের গতি না বুঝেই সে বলে ফেলে,বিয়ে হয়ে গেলে নানারকম গয়নাগাঁটি, বসন-ভূষণ পেলে সেরে যাবে।পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ত্রৈলোক্যনাথ তীর্যক ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন এই উপন্যাসে। নারীর হৃদয়ের বিশেষ বালাই নেই, সে শারীরিক সুখ ও অলংকারের প্রত্যাশী— নারী সম্পর্কিত পুরুষের এই ধারণার বিরুদ্ধে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ বেশ তীক্ষ্ণ।

অসুস্থ কুসুম বিয়ের আসরে অচৈতন্য হয়ে পড়লে সবাই তার শুশ্রূষা করার চেষ্টা করে। তখন বরবেশী দিগম্বর অনাবশ্যক বাধা সৃষ্টি করে। যাদব ডাক্তার কুসুমের মাথাটি তার হাঁটুর ওপর রাখলে দিগম্বর রেগে গিয়ে ডাক্তারকে ভর্ৎসনা করে, এমনকি চড়ও মারে। দিগম্বরের এই পাগলামি, বিয়ে হওয়ার আগেই স্বামী হিসেবে অধিকার আদায়ের চেষ্টা, কুসীর প্রতি তার অযৌক্তিক অধিকারবোধ, চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য গয়নার লোভ দেখানো ইত্যাদি বিস্ময় মিশ্রিত কৌতুকের সৃষ্টি করে।যদিও এরমধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে অধিকারভুক্ত করা বা প্রলোভন দেখিয়ে বশ করার প্রবণতাকে লেখক বিদ্ধ করেছেন।

অসুস্থ কুসীকে সন্ন্যাসীবেশী হীরালাল বুকে তুলে নিলে দিগম্বর রসময়বাবুকেও কথা শোনাতে দ্বিধা করেনি। সে কোনওমতে বাকি মন্ত্র পড়ে বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চায়। কিন্তু সে শেষরক্ষা করতে পারেনি। বিয়ের আসরে তার স্ত্রী জগদম্বা রণরঙ্গিনী মূর্তি নিয়ে হাজির হয়। দিগম্বরীর আগমন উপন্যাসে রঙ্গ-রসের ক্লাইম্যাক্স ঘটিয়েছে। রূপে, কণ্ঠস্বরে, চেহারায়, ব্যবহারে দিগম্বরের কাছে দিগম্বরী ভয়ের প্রতিমূর্তি। দিগম্বরের বিবাহসভায় তার উপস্থিতি লক্ষ করে নিজের বিয়েই অস্বীকার করে বসে দিগম্বর— "বে! কাররে? আমি বে করতে আসি নাই মাইরি বলিতেছি, ...হয় না হয় তুমি বরং এই রসময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখো।"

এই বিয়ে উপলক্ষে উপন্যাসে যে রঙ্গব্যঙ্গের প্রাচুর্য তার মধ্যে দিগম্বরীর পাশাপাশি বিন্দিঝি ও হিন্দুস্থানি চাপরাশি উপযুক্ত পরিমাণ হাসির উপকরণ জুগিয়েছে। শুধু তাই নয়, এরা দিগম্বর-সহ গোটা সমাজব্যবস্থারও সমালোচনা করে। কন্যাপক্ষের অভিভাবকদের কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত, বিবেচনাহীন কাজের নিন্দা করতেও তারা ছাড়েনি। "...এই বাবুগুলোইবা কি বল দেখি? চোখের মাথা খেয়ে গয়নার লোভে এই তিনকেলে ফোগলা বুড়োর হাতে তারে মেয়ে গুঁজে দেবে, তা ওবেচারাই বা করবে কি?"

স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় মিথ্যা কথা বলে, সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে দিগম্বর বিয়ের আয়োজন করেছিল। কিন্তু বিয়ের আসরে সব সত্যি সামনে চলে আসে। সঙ্গে জগদম্বার তীব্র গালিগালাজ সব মিলিয়ে দারুণ রঙ্গরস সৃষ্টি করে।

একদিকে যেমন রঙ্গ-ব্যঙ্গ, কৌতুকের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে তেমনই অন্যদিকে কুসুম, হীরালাল, মাসি-মেসোকে নিয়ে যে কাহিনি বৃত্ত গড়ে উঠেছে সেখানে দেখানো হয়েছে সমাজের দরিদ্র, অসহায় মানুষের করুণ অবস্থা। বিশেষ করে সেকালে সমাজে মেয়েদের অবস্থান বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কুসী, তার মা ও মাসির চরিত্রের ধধ্যে দিয়ে যা মূলত করুণ রসাশ্রিত। পল্লিগ্রামের আচার-বিচার,সংস্কার মরণাপন্ন প্রসূতিকেও ছাড়ে না। তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় কুসুমের মায়ের আঁতুড়ঘরের দিকে তাকালে। এমনকি সমাজের ভয়ে ডাক্তারের পরামর্শকেও অমান্য করে রসময়বাবু— "দু'চারটে নারকেল পাতা দিয়ে চিরকাল আমাদের আঁতুড়ঘর হয়। আর যদি আমি তাহার অন্যথা করি তাহলে সকলে আমার নিন্দা করবে।"এখানে জীবনের থেকে নিন্দাই বড় হয়ে উঠেছে। চরম দারিদ্রকে সঙ্গী করে মাসীর কাছে কুসী বেড়ে ওঠে। তাকে দেখানো হয়েছে সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবে নির্যাতিত কন্যারূপে।ষোলো বছরেও সে অবিবাহিতা জেনে বেমানান পাত্রের হাতে তাকে তুলে দিতে চেয়েছে তার বাবা। অন্যদিকে তার বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তার মাসি তার প্রথম বিয়ের কথা গোপন করে গেছে। গ্রামে বাস করেও কুসুমের মাসি রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী নয়। তিনি কুসংস্কারমুক্ত, চেতনাসম্পন্ন। দারিদ্র তার স্নেহশীল হৃদয়ের কোনও সদগুণ নষ্ট করতে পারেনি। কুসীকে ঘিরে তার কল্যাণী ইচ্ছা উপন্যাসে স্নিগ্ধ আবহ তৈরি করেছে।

উপন্যাসটিতে আগাগোড়া করুণরস ও হাস্যরসের মিশ্রণ ঘটেছে। তবে শেষপর্যন্ত কৌতুকের পরিমাণ বেশি। অন্ধধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারাচ্ছন্নতার প্রতি লেখক আঘাত করেছেন। বিন্দির 'দিগম্বরীব্রত'-র নামে লোক ঠকানোর উপায়টি 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। ন্যায়নীতির দণ্ডবিধান বা উপদেশ দানের কোনও ব্যাপারই নেই, আছে সমাজের করুণ ছবি। অসাধারণ সামাজিক ব্যঙ্গের পরিচয়ও আছে। অশেষ মজা লুকিয়ে আছে দিগম্বরবাবুর পত্রের মধ্যে। যা উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। আর এখানেই ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র নিয়ে হাজির হয়েছেন।

আগে উল্লেখ করেছি। এবার বলা যায়,'মানুষ ও ভূত' গল্পগ্রন্থের চতুর্থ গল্প 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'। অসুন্দর,অসত্য, কৃত্রিম, ছদ্মবেশী বিষয়কে লেখক পছন্দ করতেন না। তবে এইসব অপছন্দের বিষয়গুলি জানানোর জন্য এখানে তিনি সমাজ বা রাষ্ট্রকে সরাসরি আক্রমণ করেননি। করেছেন ভণ্ড, ছদ্মবেশী মানুষকে। হাসির হাল্কা আবরণে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের গভীর সত্যকে প্রকাশ করেছেন। এই গল্পে গল্প বলার বৈঠকি ঢং, আসর জমানোর মৌখিক রীতি প্রথম দেখা যায়। সঙ্গে আছে কৌতুকের অজস্র উপকরণ। বাঙালি তথা ভারতবাসীর অস্থিমজ্জার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ধর্মবিশ্বাস। এই ধর্মই একশ্রেণির মানুষের ব্যবসার প্রধান উপকরণ। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা এবং নির্লজ্জভাবে অসহায় মানুষদের ঠকানো—এই দুটো দিকই এই গল্পে রয়েছে।

নয়নচাঁদ গুলির আড্ডায় সে তার লোক ঠকানো ব্যবসার ভেতরকার কথা সবই বলে দিয়েছে আজগুবি গল্প বলার ঢঙে। শীতলা পুজোর ব্যবসার গল্প, মিস্তিরজার গল্প, নেই আঁকুড়েদার গল্প, যমপুরী বিধি-বিধান উল্টে দিয়ে সবকিছু তোলপাড় হওয়ার গল্প— এমনই নানা গল্পের মধ্যে আছে কৌতুক, হাসির উচ্ছ্বাস আর মৃদু ব্যঙ্গের খোঁচা।

দেবদেবীর প্রতি সাধারণ মানুষের অন্ধভক্তি এবং অবৈজ্ঞানিক লোকবিশ্বাসকে মূলধন করে এক ধরনের ধর্মব্যবসায়ী আমাদের সমাজে চিরকাল প্রসার জমিয়ে চলেছে। নয়নচাঁদ তাদেরই প্রতিনিধি। মহামারীর সময় এঁটেল মাটি আর সিঁদুর রাংতা দিয়ে সে শীতলার মূর্তি গড়ে লোক ঠকিয়ে বেড়ায়। বসন্ত রোগের ভয়ে লোকে পুজো দিতে শুরু করে। লৌকিক ব্রতকথা অনুসরণে একটা ছড়াও বানায় সে যা কৌতুক সৃষ্টি করে—"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই/ছেলে বুড়ো আন্ডা বাচ্চা টপটপ খাই।/...চা'ল পয়সা আনো হবে পূজার বাজার/বসন্ত

ধরিবে নয়তো চোষট্টি হাজার।।" শুধু সেকালে নয়, একালেও সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নয়নচাঁদের মতো ঠগ, জোচ্চোর, সুযোগসন্ধানী মানুষের অভাব নেই।

চরম গুলিখোর নয়নচাঁদ 'সাদাচোখেদের' জিলিপির প্যাঁচের মতো মন হওয়ায় তাদের বিশ্বাস করেনা। আবার পেশাদার মাতালদের ওপরেও তার ভরসা নেই। কারণ, তারা বেসামাল হলে গুলিখোরদের নেশা যেমন ছুটিয়ে দিতে পারে তেমনই ধর্মব্যবসায়ীদের ব্যবসাও ঘুচিয়ে দিতে পারে. 'মিত্তিরজার গল্প'-এ মিত্তিরজা নয়নচাঁদের 'জাগ্রত' শীতলা কেড়ে নিয়ে তাকে প্রহার করে। পরে বসন্তে তার মৃত্যু হলে ভূত হয়ে নয়নচাঁদের জাগ্রত দেবতা ফিরিয়ে দিতে আসে। সে মৃত্যুকালে যমের ভয়ে চন্দ্রায়নে পালায় আবার পুণ্য লাভের জন্য ব্রাহ্মণকে শীর্ণ গোরু দান করে। সারা গল্পে এইরকম কৌতুকের সঙ্গে সূক্ষ্ম সামাজিক ব্যঙ্গের ছড়াছড়ি।

খাদ্য খাবারের ব্যাপারে মিথ্যা সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য লেখক এনেছেন 'নেই আঁকুড়েদা'-র চরিত্রটি। সে জীবন্ত অবস্থায় যমালয়ে গিয়ে যুক্তি দিয়ে যমরাজকে বোঝায়— খারাপ কাজের কথা মনে করলে যদি পাপের শাস্তি হয় তাহলে ভাল কাজের কথা মনে করলে পুণ্যের ফলও দিতে হবে। তার বিধবা বোন একাদশীর দিনে ভেবেছিল পরেরদিন সে ভাত খাবে। এইজন্য যমরাজ তার মাথায় ডাঙস মারার নির্দেশ দেয়। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি কৌতুককর মনে হলেও এর মধ্যেদিয়ে লেখক সমাজে নারী নির্যাতন, বিশেষ করে বিধবাদের ওপর সমাজের কঠোর অনুশাসনের কথা বলে দিয়েছেন।

মিত্তিরজার সারা জীবনের পাপ-পুণ্যের হিসেবে পুণ্যের থেকে পাপের বোঝা বেশি। মৃত্যুকালে ব্রাহ্মণকে গোরু দান করার জন্য যে সামান্য পুণ্য সঞ্চয় করেছিল, সেই পুণ্যফল সে আগে ভোগ করতে চায়। সেইমতো যমরাজ তাকে অনুমতি দেন, সে তার ষাঁড়কে দিয়ে 'আজ' যা খুশি করিয়ে নিতে পারে। ধূর্ত মিত্তিরজা ষাঁড়কে বলে,"তোমার একটি শিং যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও।আর একটি শিংচিত্রগুপ্তের নাভিকুণ্ডলে দিয়া আজ সারাদিন এই দুইজনকে বনবন করিয়া চরকির পাক খাওয়াও।"শুনে যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত দু'জনেই সিংহাসন ছেড়ে পালান। তখন মিত্তিরজা যমরাজের সিংহাসনে বসে বহু পাপীদের মুক্তি দেয়। এই বর্ণনায় প্রচুর হাসির উপাদান আছে সন্দেহ নেই।তবে এর মজাটুকু উপভোগ করলেও এই ঘটনাকে আমরা আলাদাভাবে দেখতে পারি। যেমন, যমরাজ শাসকের প্রতিনিধি আর মিত্তিরজা শাসিতের। ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় সব লেখক সমান সাহসের সঙ্গে শাসকের সমালোচনা করতে পারতেন না। নানারকম বাধা থাকত। সেই বাধা অতিক্রম করে গেছে ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁর বাস্তব-অবাস্তব, প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক মেশানো অসঙ্গতিপূর্ণ ফ্যান্টাসির জগৎ দিয়ে। শিশিরকুমার দাশ এপ্রসঙ্গে বলেছেন,"ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যলোকের আকাশ উদ্ভট কল্পনা কিন্তু ভূমি সামাজিক। তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি যেমন স্বপ্ন, ভূত-প্রেতের কথাবার্তা, জীবজন্তুর পরিচয় ব্যঙ্গের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ...তাঁর ব্যঙ্গ দুটি পথ নিয়েছে। কখনও ভূত-প্রেত বা জীবজন্তুর মধ্যে কখনও স্বয়ং মানব চরিত্রের মধ্য দিয়ে।"

ত্রৈলোক্যনাথ অন্যান্য গল্পের মতো এই গল্পেও ভূত-প্রেত,স্বর্গ-নরক, যমরাজ -যমদূত ইত্যাদি প্রসঙ্গ এনেছেন শুধু মজা করবার বা হাসানোর জন্য নয়। এর পিছনে তাঁর অন্য উদ্দেশ্য ছিল। গল্প শেষে লেখক দেখিয়েছেন, শিক্ষিত সমাজও ধর্মের মোহে নিজেদের যুক্তিবুদ্ধি বিসর্জন দিয়েছে। নয়নচাঁদেরই বক্তব্যে তা স্পষ্ট—"আগে যদি একগুণ প্রসার ছিল এখন দশগুণ প্রসার হইল। কলেজের সেই যারা এম.এ পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। ...ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। ...আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তেরডাক্তার হইলাম।" এই বুজরুক ধর্মব্যবসায়ীদের আমরা আজও চিনি।

নয়নচাঁদ ধর্ম নিয়ে লোকঠকিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে তবুও তার প্রতি আমাদের বিদ্বেষ তৈরি হয় না। বড়জোর আমরা তাকে নিয়ে সমালোচনা করতে পারি। তার কারণ, তারা এই সমাজেরই ফসল, যাদের সামনে রেখে লেখক তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করেছেন। যদিও বর্তমান সমাজের দিকে যদি তাকালে এরকম অজস্র আধুনিক নয়নচাঁদের দেখা পাব।

ত্রৈলোক্যনাথ প্রাচ্য গল্প ধারার শ্রেষ্ঠ সাধক। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে উদ্ভট কল্পনা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ,আজব চিন্তাভাবনা, আজগুবি ধ্যানধারণা তাঁকে অন্যান্য লেখকের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। তার অন্যতম লক্ষণ দেখা যায় 'ডমরু চরিত'-এ। সমগ্র বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে ডমরুর সমতুল্য চরিত্র প্রায় নেই বললেই চলে। গল্পের মধ্যে গল্প, তারমধ্যে গল্প, এইভাবে গল্প বলার যে প্রাচীন বৈঠকি রীতি, তার সার্থক প্রয়োগ 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' বা 'মুক্তামালা'-য় আমরা দেখেছি কিন্তু তার চূড়ান্ত ও সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে 'ডমরু চরিত'-এ।

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গল্পের আড্ডার ছবি অন্যত্র দেখা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে 'ডমরু চরিত'-এর পার্থক্য আছে। বৈঠকি রীতির অন্য গল্পগুলিতে নেশাখোরেরা সবরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপারকে বিনাদ্বিধায়, নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছে। কিন্তু ডমরুর গল্পের আসরে তার 'সাদা চোখের' শ্রোতারা অনায়াসে মিথ্যাবাদিতার মাঝে মাঝেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ডমরু অবশ্য তাতে বিচলিত না হয়ে উত্তর জুগিয়েছে। 'কুম্ভীর বিভ্রাট'গল্পে বেগুনের ঝুড়ি সমেত সাঁওতালনিকে কুমির খেয়ে ফেলার পরেও দেখা যায় সে মৃত কুমিরের পেটের ভেতর দোকান পেতে বসেছিল। বেরসিক লম্বোদর এটা শুনে প্রশ্ন করে,"কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল? কুমিরের পেটের ভিতর সে খরিদ্দার পাইল কোথায়?"

ডমরু নানা ধরনের মিথ্যে অনায়াসে বলে যেতে পারে। ধরা পড়লে লজ্জিত না হয়ে প্রসঙ্গ বদলে আবার মিথ্যে বলে। আজগুবি গল্প বলার ক্ষেত্রে তার জুড়ি নেই। নিজেকে নিয়েই সে গর্বিত।সে অত্যন্ত হিসেবি এবং কৃপণ। তার কাছে টাকা জমানোর কৌশল একটু আলাদা।"টাকা উপার্জ্জন করিলেই টাকা থাকে না; টাকা খরচ না করিলেই টাকা থাকে।"তাই প্রতিবেশীর মোহর চুরি করে সুন্দরবনে সে আবাদ কেনে। স্ত্রীকে গিল্টির গয়না উপহার দেয়। স্বদেশি কোম্পানি খুলে গরীব-দুঃখীদের টাকা মেরে দেয়। এমনকি জালিয়াতির খাস সঙ্গীটিকে পর্যন্ত বখরা দেয় না।ডমরু ডাক্তারের ভিজিট ফাঁকি দেয় এবং নিজের মুখেই নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা প্রকাশ করে— "আজ যদি কৃত্তিবাস,কাশীদাস থাকতেন তাহা হইলে আমার বুদ্ধি, আমার বীরত্ব, আমার কীর্ত্তির বিষয়ে তাঁহারা ছড়া বাঁধিতেন।"

ডমরুধর মিথ্যেবাদী, স্বার্থপর, অতিরিক্ত হিসেবি, প্রবঞ্চক এবং সব রকমের মূল্যবোধ বর্জিত চরিত্র। তবুও তার ওপর আমাদের রাগ হয় না। সে সবকিছু খোলাখুলিভাবে বলে গেছে, কোনও কিছু ঢাকবার চেষ্টা করেনি। শিশিরকুমার দাশ বলেছেন,"নয়নচাঁদ ও ডমরু বাংলা সাহিত্যের দুটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র।...দুজনই সুযোগ বুঝে লোক ঠকিয়ে কাজকর্ম করায় ওস্তাদ।"

গাছে ঝোলা সাধুর কারসাজিতে ডমরুধরের লিঙ্গশরীর ধারণ এবং আকাশে বিচরণ, ফিরে এসে সন্ন্যাসীকে জব্দ করার জন্য বাঘের শরীরে প্রবেশ,আকাশ-বুড়ির বটি দিয়ে সূর্য কেটে নক্ষত্র তৈরি করা, আবার সকালে সেগুলো ঝাঁট দিয়ে পুনরায় সূর্য বানানো, সুন্দরবনে চড়ুই পাখির মতো মশা ধরে তার মাংস খাওয়া, মশা মারার জন্য জাল মশারি, তির-ধনুকের ব্যবহার, চুম্বকের কালীমূর্তির গুণে সিন্দুকের হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য, গয়নার লোভে ডমরুধরের কুমির ধরার উদ্যোগ— এসবই উদ্ভট রসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একইরকম আজগুবি তার পায়ে রাহুর কামড়, বাঘের পেটে বসে চিঠি লেখা ও সেই চিঠি পেয়ে কর্মচারীর এসে পড়া, চঞ্চলার গাইগোরুর সঙ্গে ডমরুধরের মুড়ো

সন্ধি, ভূতের হাতে কামড়, সাক্ষাৎ কার্তিক ডমরুর ময়ূরের পিঠে চড়ে আকাশবিহার ও জিটেলমন্ত্র উচ্চারণ। এসব ক্ষেত্রে উদ্ভট কল্পনার কোনও তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

লেখক কৌতুকরসের পাশাপাশি অত্যন্ত শিল্পসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন সামাজিক অসঙ্গতিকে। ধর্মের হুজুগে ভণ্ডামি এবং মানুষের অন্ধবিশ্বাসের প্রতি লেখকের কটাক্ষ আছে গাছে ঝোলা সাধু ও রসিক মণ্ডল প্রভৃতি প্রসঙ্গে। এছাড়া যমপুরীতে ডমরুধরের অভিজ্ঞতা অতুলনীয়। সেখানকার বিচারব্যবস্থার স্বরূপ যমরাজের উক্তিতে প্রকাশিত। "...পৃথিবীতে গিয়া মানুষ কি কাজ করিয়াছে, কি কাজ না করিয়াছে তাহার আমি বিচার করি না। মানুষ কি খাইয়াছে, কি না খাইয়াছি তাহার বিচার করি।"

এই বিচারে ডমরু একাদশীর দিন পুঁইশাক না খাওয়ায় স্বর্গলাভের অধিকার পেয়েছে। সেখানে 'আশাণ্ড'-এ পৌঁছে এক 'ছেলে খেকো' বক্তার দেখা পেয়েছে। একখণ্ড অন্ধকারের ওপর দাঁড়িয়ে যে বক্তৃতা করে এবং যার বক্তৃতা অসুরদের কানের পোকা বের করে দেওয়ার ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাজনীতিকদের বক্তৃতা নিয়ে এমন শেল বেঁধানো ব্যঙ্গের চমৎকার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্য ত্রৈলোক্যনাথের আগেও পায়নি, পরেও নয়।

আবার মক্ষিকার বিষ্ঠা থেকে পুদিনা গাছ এবং মশার শুঁড় থেকে জোঁকের উৎপত্তি, মানুষখেকো গাছের ভূত ধরে খাওয়া, সেই ভূতের খোসাটি গাছতলায় পড়ে থাকা, লাল ঘাঘরা পরা ডমরুর অদ্ভুত রূপ,এলোকেশীর বারবার ঝাঁটাপেটার বর্ণনা সত্যিই অতুলনীয়। এই ধরনের অভাবনীয় ছবি আঁকাতেই ত্রৈলোক্যনাথের মাহাত্ম্য। এসব আজগুবি বর্ণনায় তাঁর জুড়ি নেই।

ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গকৌতুক মিশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি গল্প 'লুল্লু'। এটি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁর স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত একটি বিশেষ স্মরণীয় সংযোজন। ছোটদের ভয় দেখানোর জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত, অর্থহীন নাম ব্যবহার করে থাকি। ঠিক সেইরকম আমির তার স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য বলেছিল—"লে লুল্লু।"সে জানত না লুল্লু ভূতের নাম। জানত না যে তখনই লুল্লু তাদের ঘরের চালে আলিশার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। একথা শুনে লুল্লু আমিরের স্ত্রীকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দুর্গম স্থানে বন্দি করে রাখে। ত্রৈলোক্যনাথ লিখছেন—"চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী নারী। ...এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন।"

নারী অপহরণ সেকালে সমাজে অন্যতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। এই ঘটনাকে আমরা সেই প্রেক্ষিতে দেখতে পারি যার মূলে আছে নারীর প্রতি আসক্তি ও তাকে অপমান করার প্রবৃত্তি। আর একালেও তার নিদর্শন রোজকার খবরে খুঁজতে হয় না। প্রতিদিন এমন হাজারো ঘটনা আমাদের আতঙ্কিত ও অসহায় করে রাখে।

আমিরের স্ত্রী হারিয়ে গেলে আমির ফকিরের বেশে তার খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়েএবং একাধিক ভূত ও মানুষের সংস্পর্শে আসে। যেমন গণৎকার, যে মানুষের সবরকম গুপ্তকথা বলে দিতে পারে।আমির স্ত্রীর খোঁজ তার কাছ থেকেই পায়। এর পর রয়েছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ রোজা, যে ভূত ছাড়াতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তার প্রকৃত বিদ্যাটি ফাঁস হয়ে যায়। একটি জলজ্যান্ত ভূতের অনুগ্রহ আর তাঁতির গানের মাহাত্ম্যে সে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ভূত ছাড়ানোর রোজা হিসেবে নাম কিনেছে।এইসব ভুয়ো, লোক ঠকানো পেশাকে যেমন লেখক কটাক্ষ করেছেন তেমনই বিচিত্র চরিত্রচিত্রণ ও অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশের ফাঁকে ফাঁকে সামাজিক ব্যঙ্গও কৌতুকদীপ্ত হয়ে উঠেছে।তিনি সমাজের কুসংস্কার, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণকারী নব্য যুবকদের কখনও কখনও ব্যঙ্গ করেছেন। লুল্লু সভ্য-ভব্য-নব্য ভূত। তাই আমিরের স্ত্রীকে অপহরণ করার পরেও জোর করেনি। তাকে বুঝিয়েছে, অপেক্ষা করেছে, তার সমস্যা খুঁজে বের করে সমাধান করার চেষ্টা করেছে। লুল্লু কালো কিন্তু সাহেবদের মতো ফর্সা হওয়ার ইচ্ছে তার প্রবল। কারণ,

সে সাদা চামড়ার মর্যাদা বোঝে। আমিরের স্ত্রীকে বিয়ে করার জন্য সে বলে,"দেখ, এখন আমি সাবাং মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ...আর কিছুদিন পরে লোকে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। যেখানে যাইব সকলে বলিবে এ 'লুল্লু' নয় এ সাহেব ভূত। কোন লর্ডের ছেলে হইবে।"

ঊনবিংশ শতকের নব্য শিক্ষিত যুবকদেরআচরণগত বিকারের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় এই গল্পে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে সভ্য হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার যে প্রচণ্ড মোহ সেসময়ে দেখা গিয়েছিল লেখক তাকেই তীব্র কটাক্ষ করেছেন। এসব ভূত আসলে ভূত নয়। দিনেদুপুরে এইসব ভূতের আবির্ভাব ঘটিয়ে মানুষের কুসংস্কারকে লেখক সকৌতুকে বলেছেন। ভূতেদের স্বরূপ বিশ্লেষণ লুল্লু বলছে—"জল জমিয়া যেমন বরফ হয় তেমনি অন্ধকার জমিয়া ভূত হয়। ... নিশাকালে বাহিরে তো অল্প অল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতরে যে কত অন্ধকার আছে তাহার সীমা নাই।"সে আরও বলে,"জল জমিয়া বরফ করিবার কল আছে অন্ধকার জমিয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবরা করিতে পারেন না?"

এখানেই শেষ নয়। ভূত কেনা-বেচার ব্যবসা, ভূতে ধরা, ভূতগিরি করা, ভূতের রাজ্যে বেকার সমস্যার পাশাপাশি মানুষের মতো ভূতের বিয়েতে ভাংচি দেওয়ার কথাও আছে।

আবার ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে যেসব মানুষ সবকিছু যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চাইছিল তাদের কথাও রাখতে ভোলেননি ত্রৈলোক্যনাথ।শিক্ষিত সমাজ মানতে চায় না যে কাউকে ভুতে ধরেছে। বলে ভূত নয়, হিস্টিরিয়া! ফলে ভূতসমাজ বিপন্ন হয়ে ওঠে।ডাইনিরা বলে,"...ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসা পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলি এমনই ইংরেজি ভাবাপন্ন হইয়াছে যে কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে বলে কিনা হিস্টিরিয়া হইয়াছে। একথায় রক্তমাংসের শরীরে রাগ হয়, ভূত দেহেতো রাগ হইবেই।"তাই তারা একত্রিত হয়ে ঠিক করে, আর কাউকে ভূতে পাবেনা। ডাইনে খাবে না। আসলে শিক্ষার সংস্পর্শে এলে মানুষের চিন্তার জগতের প্রসার ঘটে। ফলে অন্ধবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি ভূতেরা তাতে খুশি হয় না। ভূতেরা এখানে প্রতীক,যা লেখকের সামাজিক ব্যঙ্গের অন্যতম উপাদান।এখানে বিভিন্ন ভূতের আড়ালে রয়েছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিরা।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিজের সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার বিবরণ দিতে গিয়ে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর টেবিল, চেয়ার, কাঁটা-চামচে খাওয়ার অনুকরণকে খোঁচা দিয়েছে। গলায় দড়ি ভূত সে, বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। কাউকে ভয় পায় না, শুধু ইংরেজি শিক্ষিত বাবুদের ভয় করে। কারণ, তারা মদ খেয়ে যদি গায়ে বমি করে দেয়। আবার ভক্তিও করে। কারণ, মদ খাওয়ার জন্য তাদের মনের সংকীর্ণতা ঘুচে গেছে। যে সংকীর্ণতা তাদের সমাজে আছে। তাই ঘ্যাঁঘোঁও নাকেশ্বরীর বিয়েতে পৃথিবীর সব ভূতেদের নিমন্ত্রণ করার কথা উঠলে লুল্লু জানায়—"আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল ভ্রষ্ট হইব।"

মনে রাখা দরকার যে সেই সময়ে জাতিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে সমাজপ্রধানরা দু-দু'বার ত্রৈলোক্যনাথের বিলেতেযাত্রায় বাধা তৈরি করেছিলেন। একবার ১৮৭৫ সালে। উইলিয়াম হান্টার তাঁকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। পরের বার ১৮৮২ সালে। সেবার আমস্টারডামে একটি শিল্প প্রদর্শনীতে আমন্ত্রিত ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ। অবশ্য ১৮৮৬ সালে তিনি একবার এবং পরে আরও একবার ব্রিটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে এসে তাঁকে যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কাজেই 'লুল্লু' গল্পে ভূতেদের মুখে যে কথা রয়েছে তা সমাজের মাথাদের লক্ষ্য করে ত্রৈলোক্যনাথেরই ব্যঙ্গ।

এখানে ধর্মের প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি তীব্র বিদ্রুপ লেখক ভূতের মুখে বসিয়েছেন। বাস্তব জগতে ভূতের কোনও অস্তিত্ব নেই। তার অস্তিত্ব একমাত্র মানুষের মনে। ভয় আরকল্পনা থেকে রাতের অন্ধকারে মানুষের মনে ভূতের ধারণা গড়ে ওঠে। তাই সব ভূতের গল্পে রাতের অন্ধকারে ভূত দেখা যায়। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর লেখায় দিনেদুপুরে ভূতের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষের মনের অন্ধকারের কথা। আর এখানেই তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। গল্পটি আপাতদৃষ্টিতে ভূতের গল্প মনে হলেও তার সমাজ পর্যবেক্ষণকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি ভূতেদের সমাজের শ্রেণিবিন্যাস, কাজকর্মের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার আজগুবি অংশটুকু বাদ দিলে বাকি সবই রূপক হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কখনও অন্ধবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি, কখনও প্রান্তিক মানব সমাজের প্রতিনিধি, কখনও ইংরেজি শিক্ষিত যুবকের প্রতিমূর্তি হিসেব আবার কখনও সংবাদপত্রের সম্পাদক রূপে ভূতের দেখা পাওয়া গেছে। ভূত সমাজের রীতিনীতি, বিধি-বিধান প্রসঙ্গে মানুষের সমাজের কুসংস্কার, ভিত্তিহীন ধর্মবিশ্বাস এবং অহেতুক রক্ষণশীলতার দিকেই আঘাত করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ।

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর লেখায় গল্প বলার দেশজ ধারণাটিকেই ব্যবহার করেছেন বারবার। আমরা সেদিকে বিশেষ খেয়াল করিনি। বিদেশি ভাষার সাহিত্যে এমন ঘটলে তা নিয়ে গবেষণা হয়ে যায়। 'লুল্লু' প্রসঙ্গে একটি অন্য লেখার উল্লেখ করতে চাই। ত্রৈলোক্যনাথের 'ভূত ও মানুষ' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় বাংলা ১২৯৮ সালে, অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯১ সালে। নাইজেরিয়ার লেখক এমোস টুটুওয়ালার লেখা 'দ্য পাম ওয়াইন ড্রিঙ্কার্ড' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। সেই লেখায় দেখা যায় এক বড়লোকের ছেলে তালের রস থেকে তৈরি করা তাড়ি বা মদে বেজায় আসক্ত। তাকে তাল গাছ থেকে রস নামিয়ে দেয় একটি লোক। সেই লোকটি আচমকা মারা গেলে ধনী মানুষটি বিপদে পড়ে। তার পর তাকে কেউ বলে যে সেই রস নামানোর লোকটি রয়েছেমৃতদের শহরে। সেখানে গেলে তাকে ফিরে পাওয়া যেতে পারে। ধনী ও নেশাড়ু মানুষটি সেই লোকটিকে ফিরিয়ে আনতে বেরিয়ে পড়ে। যাত্রাপথে সে অদ্ভুত এক জগতে ঢুকে পড়ে, বিচিত্র সব প্রাণীর সঙ্গে দেখা হতে থাকে তার। সে জগৎ অ্যাবসার্ডিটির। শেষে সে একটি ডিম সদৃশ বস্তু পায় যেখান থেকে নেশার জন্য অনন্ত তালের তাড়ির জোগান পাওয়া যাবে। আফ্রিকার লেখালেখি সম্পর্কে এই উপন্যাসটি বহুল আলোচিত। ত্রৈলোক্যনাথের 'লুল্লু' লেখাটির সঙ্গে 'দ্য পাম ওয়াইন ড্রিঙ্কার্ড' লেখাটির মিল খুঁজে পেতে পারেন যেকোনও মনোযোগী ও অনুসন্ধানী পাঠক। এই উল্লেখ এই কারণে যে, ত্রৈলোক্যনাথের লেখার যে জগৎ তা বিশ্বসাহিত্যের অ্যাবসার্ড লেখালেখির সঙ্গেও তুলনীয় হতে পারে। সেখানেও তাঁর লেখা বিশেষ দৃষ্টান্তের দাবিদার। তবে অনুবাদে আমাদের চিরকালের দুর্ভাগ্য।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিবিড়। দু'ধরনের লেখাতেই আছে সমাজবীক্ষণ ও সমাজবিজ্ঞান। দু'জায়গাতেই তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। লোকায়ত অভিব্যক্তির নানারূপ, লোককথা, রূপকথা, ব্রতকথা, কিংবদন্তি ইত্যাদির অদ্ভুত ও উদ্ভট উপাদান সমন্বিত ফ্যান্টাসি তাঁর সাহিত্যে দিয়েছে স্বতন্ত্রতা ও সজীবতা।

উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নতুন ধরনের হাস্যরসের সৃষ্টি ত্রৈলোক্যনাথের হাতেই। জীবনকে তিনি দেখেছেন খোলা চোখে। বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকীর্ণ হতে দেয়নি। তিনি চেয়েছিলেন দেশের মানুষ আরও এগিয়ে আসুক, সমস্ত কুসংস্কার, অজ্ঞানতাকে কাটিয়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করুক। ত্রৈলোক্যনাথের এই উপলব্ধি এবং জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি তাঁর সাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। সমাজের

নানা অসংগতিকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন কিন্তু তার মধ্যে কঠোরতা বা নির্মমতা নেই। তার মূলে ক্ষোভ আছে, বেদনাবোধ আছে কিন্তু কুটিল কোপ নেই। তাঁর ব্যঙ্গদেখিয়ে দেয় সামাজিক ত্রুটির দিকটি।

লিখিত গল্পে গল্পশোনার রসসৃষ্টি করা দুর্লভ প্রতিভার দ্বারাই সম্ভব। প্রচলিত গল্প রচনার ধারা থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে পথ হেঁটেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। লিখিত গল্পে তিনি এনেছিলেন বৈঠকি গল্প বলার স্বাদ। প্রমথনাথ বিশী ত্রৈলোক্যনাথ সম্পর্কে বলেছেন, তিনি "শিথিল পিনদ্ধ ফ্রেমের মধ্যে বহুতল গল্পকে সন্নিবেশ করিয়া রস জমাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।এগুণ সামান্য গুণ নয়।"

বাংলা কথাসাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের জুড়ি আজও পাওয়া যায়নি। তাঁর মতো অদ্ভুত ও আশ্চর্য উপাদানের প্রয়োগ আর কেউ কথাসাহিত্যে করেননি। তিনি যেভাবে সাহিত্যে স্বতন্ত্র মাত্রা এনেছেন তা অননুকরণীয় এবং অনন্য তাঁর প্রতিভা। অথচ এখন তিনি প্রায় বিস্মৃত, তাঁর রচনাও দুর্লভ। এর কারণেএ কথা বলা যাবে না যেতাঁর লেখা পাঠযোগ্যতা হারিয়েছে। এর কারণ হলআমাদের উদাসীনতা। নতুন প্রজন্ম ত্রৈলোক্যনাথের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত সমস্ত রচনার ঐশ্বর্য আবিষ্কারকরতে পারলে, নতুন করে তার মূল্যায়ন করতে পারলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বিশেষ উপকার হবে তাতে সন্দেহ নেই।